প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী চেতনাবাদের উদ্ভব

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী চেতনাবাদের উদ্ভব

নারী চেতনাবাদের মূলকথা হল পিতৃতন্ত্রের অনুশাসন থেকে মুক্তি এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘকাল নারীরা পুরুষশাসিত সমাজে হীনতর অবস্থায় দিনাতিপাত করেছে এবং তাদের জীবনযাত্রা পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন একটা সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে নারী পুরুষের দ্বারা অনুশাসিত, এবং তাদের ইচ্ছার দ্বারা অবদামিত হয়। নারী চেতনাবাদের মূল কথাই হল এই ধারণাগত অবস্থান থেকে প্রকৃত অবস্থানে উন্নীত হওয়া। এই কাজে যারা নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন তাঁরা প্রথমে নারী সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণার নিরসন করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর সবদেশেই খুব প্রাচীনকাল থেকে ধর্মতত্ত্বে এবং দর্শনতত্ত্বে নারীকে পুরুষের তুলনায় হীন করে অঙ্কিত করা হয়েছে। যদিও এমন নয় যে সব পুরুষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। উচ্চতর সমাজের নারীরা যে ক্ষমতা ভোগ করে, দুর্বলতর শ্রেণীর পুরুষেরা সে ক্ষমতা ভোগ করেনা। কিন্তু সমশ্রেনীর পুরুষেরা নারীর তুলনায় বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। পৃথিবীর কোন দেশেই প্রাচীনকালে নারীরা রাজনৈতিক বা আইনগত অধিকার লাভ করেনি। তাদের শিক্ষার অবস্থাও ভাল ছিলনা। ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা রেঁনেসাঁসের পরেও খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেও তাদের যে আদর্শে গড়ে তোলা হত তা এই তিনটি কথায় এই ভাবে বলা হয়েছে 'Chaste, silent and obedient'.[১] লেখাপড়ার অধিকার ছিল কেবল অন্তঃপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বাইরের জগতে পুরুষের সমকক্ষতা সে তখনও লাভ করতে পারেনি। নারী যে পুরুষের তুলনায় দুর্বল এই নেতিবাচক ধারণা থেকে প্রথম যুগের নারীচেতনাবাদীরা নারীকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, এই যুক্তির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় যে কথাটি নারী চেতনাবাদীরা বোঝাতে চান তা হল এই— নারীরা স্বভাবত দুর্বল নন, কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাবে তাদের হীন করে রাখা হয়েছে। কাজেই নারীচেতনাবাদী লেখকদের দ্বিতীয় লক্ষ, তাদের এই সাংস্কৃতিক হীনাবস্থা থেকে মুক্ত করা। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নারীরা এই সাংস্কৃতিক হীনতা মুছে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে নারীবাদীরা বলতে চেয়েছেন — নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করা, নারীকে পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে না দেখে, নারী হিসেবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা। এই হল নারী চেতনাবাদের প্রধান তিনটি লক্ষ্য।

নারী চেতনাবাদ সম্বন্ধে যারা আলোচনা করেছেন কিংবা যারা আদিমকাল থেকে সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা মনে করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার

আগে মাতৃতন্ত্রই ছিল আধিপত্যশীল। ঠিক কি ধরণের সমাজ ব্যবস্থা সেখানে ছিল, তার সম্পূর্ণ হদিস না পাওয়া গেলেও নারীরাই আদিম সমাজব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন — এমনটা মনে করা হয়। ষ্টুয়ার্ট মিল ধরে নিয়েছিলেন পুরুষের ক্রমাগত বলপ্রয়োগের ফলে নারী জাতির আদিম প্রতিষ্ঠা ভেঙে পড়ে এবং পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নারীমুক্তি চেতনার ক্রমিক উন্মোচন একটা বড় দিক। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে আছে নারী মুক্তির ক্রমিক উদ্বর্তনেরই ইতিহাস। কোনো আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজের যে বিকাশ পরম্পরা দেখতে পাই তার সঙ্গে নারীর বিকাশের সম্পর্ক যেন অব্যবহিত। এই কারণে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে নারীমুক্তির প্রসঙ্গও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মানব সমাজের ইতিহাসকে মার্কসীয় বিচার পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিচার করে দেখা হয়েছে। লক্ষিত হয়েছে পরিবারের উৎপত্তির পিছনে যে দীর্ঘ ইতিহাসের পদযাত্রা, সেখানে যাযাবর সমাজ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। আদিম যাযাবর সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকাগত পার্থক্য থাকলেও নারীর প্রতি বিশেষ লাঞ্ছনা পীড়নের কথা জানা যায়না। মর্গ্যান কথিত সমাজের সেই আদিম অবস্থায় নারীই ছিল গোষ্ঠীর কেন্দ্রে। যৌন সম্পর্কের অজাচার কোন সামাজিক নীতির শাসনে নিষিদ্ধ ছিলনা। অনিশ্চিত পিতৃ-পরিচয়ের মধ্যে মাতাই ছিল সন্তানের পরিচয়ের কেন্দ্র এই প্রথায় কিছু পরিবর্তন ঘটলেও নারীরা গোষ্ঠীর কেন্দ্রভূমিতে বিরাজিত ছিল।

ইতিমধ্যে সমাজ অর্থনীতিতে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত বন্যপশুকে বশ করে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়, এতে প্রভূত সম্পদের সৃষ্টি হয়। ফলে এই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে। দ্বিতীয়ত কৃষির উদ্ভবের ফলে প্রাণী সম্পদ নিয়ে আর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো গেলনা। গোষ্ঠীগুলি ভূসম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে স্থায়ী হয়ে উঠলো। একদিকে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি অন্যদিকে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে উপদ্রুত উপজাতিগুলির পক্ষে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে পুরুষের বাহুবল অপরিহার্য হয়ে উঠলো। যৌন প্রথার পরিবর্তনের ফলে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রস্তরযুগে পুরুষ যখন শিকার করা মাছধরা ইত্যাদি কাজ করতো তখন নারী গৃহে বসে মাটির পাত্র তৈরী করা, কাপড় বোনা, বাগান করা ইত্যাদি করে গৃর্হস্থালীর কাজকে উৎপাদনী শ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। তাই এসময় নারীর শ্রম ছিল মূল্যবান। ক্রমে ধাতুর আবিষ্কার ও কৃষিসরঞ্জাম হিসেবে লাঙ্গলের ব্যবহারের জন্য ও ক্ষেতকর্ষণ করার জন্য গভীর শ্রমের প্রয়োজন হয়, তখন যুদ্ধবন্দী পুরুষদের এই কাজে লাগানো শুরু হয়, যারা ছিল ক্রীতদাস, 'কারণ এই সময় দাস প্রথার ও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।'[১] সম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে স্ত্রী লোকের তুলনায় পুরুষের আধিপত্য বাড়তে থাকলো এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির

উদ্ভবের ফলে নারীর অধিকার লুপ্ত হল। জমি ও দাসেদের সঙ্গে পুরুষ নারীরও অধিকারী হল। এই অবস্থায় পুরুষ স্বভাবতই তার সম্পত্তিতে নিজের সন্তানের উত্তরাধিকার, প্রতিষ্ঠা করতে চাইল কিন্তু মাতৃঅধিকার অনুযায়ী বংশধারা প্রচলিত থাকায় তা সম্ভব ছিলনা, তাই এই ধারা ভাঙা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো এবং তা ভেঙেও গেল। প্রতিষ্ঠিত হল পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। একেই এঙ্গেলস বলেছেন 'স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'।[৩] ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে পরিবারের সামাজিক ভূমিকা চলে গেল, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে স্ত্রী'র ভূমিকা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো ফলে তার কাজ সামাজিক মূল্য হারাল। এভাবে নারী শ্রমের মূল্য হারিয়ে পুরুষের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়।

তবে সিমন দ্য বোভোয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবকেই কেবলমাত্র নারীর বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় বলে দেখতে রাজী নন। তিনি মানুষের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন জৈব বাধ্যবাধকতা নারীর দুর্বলতার প্রধান কারণ, নারী-পুরুষের লিঙ্গসাম্য কোনদিন ছিলনা। পুরুষের কাছে এবং নিজের কাছেও নারী ছিল রহস্যময় — দুর্জ্ঞেয়। কৃষির উদ্ভবের পর্বে নারীর মূল্যও স্বীকৃত হয়েছিল। নারী এবং জমিকে প্রকৃতির শক্তি হিসেবে দেখে উভয়কেই উর্বরাশক্তির রূপ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হত। এই পর্বেই 'গ্রেট মাদার গডেস্' বা মহাদেবীর ধারণা বিশ্বের বহুদেশে উদ্ভুত হয়। কৃষির বিকাশের জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, জৈবিক (বাধ্যবাধকতা) দুর্বলতার কারণে নারীর পক্ষে তা জোগান দেওয়া সম্ভব হয়নি। সন্তান ধারণ ও লালন পালনের কাজে তাকে অধিক সময় ব্যয় করতে হত। ফলে সম্পদ আহরণের প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু পুরুষদের ব্যাপারটা ছিল মূলগতভাবেই পৃথক। তারা প্রথম থেকেই প্রকৃতিকে বশ করার কাজে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, প্রকৃতিকে জয় করে, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল পুরুষ। বোভোয়ার মনে করেন এখানেই আছে নারীর পরাজয়ের মূলসূত্র।

কৃষির উন্নতির ফলে যে সম্পদ আহৃত হয় তা মানুষকে অনেক বাড়তি সময় এনে দেয়। সমাজে এই সম্পদের উপর নির্ভর করে একদল ভাবুক বা চিন্তক মানুষের আবির্ভাব ঘটে, জৈবমূল্যের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, নানা দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় ঘটে, ফলে শুধুমাত্র জৈবিক উদ্বর্তনের মূল্য হ্রাস পায়। সাধারণ জীব নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে সন্তান উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মানুষ জৈব জীবনের উদ্বর্তন ঘটিয়ে তার বর্তমান জীবনকে অতিক্রম করে যায়। এই দর্শনের দ্বারা সে যে মূল্যবোধের সৃষ্টি করে তাতে জৈবিক উৎপাদন সর্ব্বোচ্চ মূল্য পায়না। পুরুষ উত্তরণের এক অন্য তাগিদ অনুভব করে,

যা নিছক সন্তানের জন্মদান নয়। পুরুষের এই উত্তরণের পর্যায়ে নারী যুক্ত হতে পারেনা জৈবিক কারণে। তবে নারী আকাঙ্খা করে এবং স্বীকৃতি দেয় ঐ মূল্যবোধগুলিকে যা পুরুষ বস্তুগতভাবে অর্জন করেছে। এইভাবে পুরুষ নারী এবং প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। পুরুষ যতই নারীকে প্রকৃতি, শক্তি ইত্যাদি মনে করে তার রহস্যের সামনে বিহ্বল হয়ে থাকুক, সে কোনদিনই শক্তিহীন ছিলনা; লেভিস্ত্র'র মতে — 'রাষ্ট্রীয় অথবা নিছক সামাজিক কর্তৃত্ব সর্বদাই ছিল পুরুষদের হাতে।' তাই যখন 'মাতৃঅধিকার' বর্তমান ছিল তখনও তা ছিল নারীর পিতার বা ভ্রাতার কর্তৃত্বাধীন। কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে নারীকে যতই উর্বরতার দেবী হিসেবে দেখা হোক্ এই দেবীর মহিমা পুরুষেরই দেওয়া। কাজেই নারীকে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনেও আছে প্রকৃতপক্ষে পুরুষশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। যতই তাকে দেবী হিসেবে দেখা হোক, ক্রমে দেবীর সত্তার গঠনও হয় পুরুষ দেবতাদের সত্তা থেকে। কাজেই নারীর সত্তাও হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের সত্তার অনুসারী। সুতরাং ভাবাদর্শের দিক থেকে নারীকে মহিমান্বিত করা সত্ত্বেও পুরুষেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

জৈবিক কারণেই পুরুষরা প্রথম থেকেই সার্বভৌম একচ্ছত্র বিষয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা কখনো এই পদ ছাড়েনি। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কিছুটা অংশ কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতি ও নারীকে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরে আবার তা জয় করে নিয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থা সর্বদা সেটাই হয়েছে, পুরুষ যা তাকে অর্পণ করেছে। এর কারণ নারী সন্তান উৎপাদন, ঋতুচক্র ,গৃহস্থালি ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থাকায় প্রকৃতি-জয়ের কাজ ও চিন্তাধারায় অংশ নিতে পারেনি, আর তাই তার মধ্যে পুরুষের মতই এক সত্তা আছে, সে তা স্বীকার করেনি; নারী তার সহযোগী না হয়ে, হয়ে উঠেছে 'অপর' (Other)। পুরুষের ক্ষমতার এবং বিস্তৃতির বাসনা নারীর অক্ষমতাকে একটা অভিশাপ করে তুলেছিল।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হবার পরে নারীরা পিতৃকুল ত্যাগ করে স্বামীকুলে এসে যোগ দেয়। পুরুষ দাস বা খামারের পশু কেনার মত নারীদের কিনে নেয়। তার সন্তানেরা স্বামীর পরিবারভুক্ত হয়। তবে কন্যা সন্তানকে উত্তরাধিকারী বিবেচনা করা হয় না। কেননা স্বামীগৃহে যাবার সময় সে পিতার সম্পত্তি অন্য কুলে নিয়ে যাবে। তাই তাকে সম্পতি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কোন কিছুতে তার অধিকার না থাকায় সে ব্যক্তি হবার মর্যাদাও ভোগ করে না। এখান থেকেই পরবর্তীকালে কন্যা সন্তান হত্যা শুরু হয়। কন্যা সন্তান হয় অস্থাবর সম্পত্তি বা ক্রীতদাসের মত। তাই বিবাহের আগে পিতা ও পরে স্বামীতে তার অধিকার হস্তান্তারিত হয়, স্বামী যতজন ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারে, সেটা তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এইভাবে যখন পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রশ্নাতীত ভাবে সমাজের ভিত্তি হয় তখন নারী সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়।[৪]

এঙ্গেল্‌স বলেছেন কোন সমাজ কতদূর বিকশিত হয়েছে, তা বোঝা যায় সে সমাজের নারীদের দেখে। দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সেখান থেকে পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাশ্চাত্যেও নারীর অবস্থা সম্মানজনক ছিল না। কারণ খ্রীষ্টান ধর্মেও নারী ছিল পুরুষের অধীন। শুধু তাই নয় টের্টুলিয়ান বলেছেন — "নারী শয়তানের দ্বারপথ।" গীর্জার পাদ্রীরা নারীকে হীন ও অশুভ বলে বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে নারী এক আকস্মিক ও অশুভ-সত্তা। রোমান আইনে নারীর অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। আদালতে তাদের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রাহ্য হত না। শুধুমাত্র স্ত্রী ও মাতা হিসেবে তাদের কিছু অধিকার ও সম্মান ছিল। ৫২৭ - ৫৬৫ খ্রীঃ রোমের জাষ্টিনিয়ান আইনে সন্তানের উপর পিতামাতার সমানাধিকার স্বীকৃত হয়, তবে সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। বহুগামিতা সমাজে প্রচলিত ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এমন কি বিয়ের ব্যাপারেও মেয়েদের মতামত গ্রাহ্য হ'ত না।

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ইওরোপের মধ্যযুগে যে সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল তা নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটায় নি, বরং অনেক অনিশ্চিত করেছিল। মেয়েরা যেহেতু উত্তরাধিকারী হত না তাই সম্পত্তির অধিকার থেকেও ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত; ফলে তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন অধিকারই ছিল না। এই সময় 'সিভাল্‌রি প্রথা' নারীর ভাগ্যকে কিছুটা সহনীয় করেছিল। তবে এখানে নারী ছিল দুর্বল এবং পুরুষরা তাদের দয়া দেখিয়ে শৌর্য, বীর্য জাহির করত। সামন্ত প্রথায় সব সময় স্ত্রী ছিল স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত। সামন্ত প্রথা বা গীর্জা কেউই নারীকে মুক্তি দেয় নি।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীর আইনগত অবস্থান প্রায় একই রকম ছিল; তবে ইতালীয় রেনেশাঁস লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাবে জোরালো ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাবের পক্ষে একটা অনুকূল যুগ ছিল, কিন্তু তা সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্যই ছিল। তবে ১৪১২ খ্রীঃ ডমরেমী গ্রামে এক অতি দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম হয় এক মহীয়সী নারীর — তিনি জোয়ান অব আর্ক— যে নারীসত্তার প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণ দুর্দান্ত ইংরেজ শাসন থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হয়।

১৬৬২ খ্রীঃ মার্গারেট লুকাসের 'ফিমেল ওরেশনস' প্রবন্ধ বিশ্বের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অবকাশভোগী মেয়েরা শিল্প ও সাহিত্যে নিজেদের নিয়োজিত করতো। ১৫৪৫ খ্রীঃ অভিনেত্রী নামে এক অজানা প্রজাতির জন্ম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর স্বাধীনতা খানিকটা বাড়ে, তারা কিছুটা অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু

মধ্যবিত্ত স্ত্রীদের উপর কঠোর নৈতিকতা চাপানো হয়। তবে এত কিছু সত্ত্বেও মেয়েরা বেরিয়ে আসছিল। ঘরোয়া শিল্প সাহিত্যের বৈঠকে তারা অংশ নিত, দর্শন ও বিজ্ঞান পড়ত, এমন কী দু'একটি রসায়নবিদ্যার গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিল। হাতে গোণা দু'একজন লেখিকাও আত্মপ্রকাশ করছিলেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তাদের অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। ফ্রান্সে নারীর এই প্রতিকূল অবস্থার বিরূদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এমন বেশ কিছু লেখিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ১৬৭৩ খ্রীঃ একজন নেতৃস্থানীয় নারীবাদী প্রকাশ করেন 'দ্য লেগালিতে দ্যে দ্য সেক্স'। তিনি মনে করতেন পুরুষ তার ক্ষমতা নিজের অনুকরণেই ব্যবহার করত। নারী অভ্যাসবশতঃ তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। নারীদের জন্য ছিল না কোন শিক্ষা বা সুযোগ। তিনি নারীদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা দাবী করেছিলেন। তবে এই প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। কিছু লেখক ও দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করতেন যে মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। রুশো নারীকে স্বামী ও মাতৃত্বের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মতে নারীর সমস্ত শিক্ষাই হওয়া উচিত পুরুষ সাপেক্ষ।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শ নারীর পক্ষে অনুকূল ছিল। ভলতেয়ার নারীর উপর ভাগ্যের অবিচারকে নিন্দা করেছিলেন। দিদেরো মনে করতেন নারীর নিকৃষ্টতা প্রধানত সমাজের তৈরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইওরোপ আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলিতে মেয়েদের অবস্থা অল্পবিস্তর একই রকম ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে নারীর সপক্ষে নানা কণ্ঠ শোনা যেতে লাগলো। এঁদের বক্তব্যের সার কথা ছিল নারী পুরুষের সম অধিকার। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হবে এমনটাই ভাবা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তার লক্ষণ দেখা যায় নি। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে ফ্রান্সের ওলিম্প দ্য গুঁজে ১৭৮৯ সালে 'নারীর অধিকার ঘোষণা'-র প্রস্তাব রেখেছিলেন 'মানুষের অধিকার ঘোষণা'-র মত করেই, যাতে তিনি বলেছিলেন সমস্ত পুরুষালি সুবিধা রদ্ করতে হবে। এবং তিনি দাবী করেছিলেন 'নারীদের যদি ফাঁসিকাঠে যাবার অধিকার থাকে তবে পার্লামেন্টে যাবার অধিকারই বা থাকবে না কেন?' নারীকণ্ঠের এই তীব্র প্রতিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল ফরাসী সরকার কর্তৃক মাদামের ফাঁসি। এই সময় ফ্রান্সে কিছু নারী চালিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কিছু নারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।"

১৭৯১ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্ট রচনা করেন নারী অধিকার বিষয়ক এক বৈপ্লবিক গ্রন্থ ঃ ''ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইট্স্ অব উওম্যান।'' ফরাসী বিপ্লবের মহান আদর্শের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন ফরাসী দার্শনিক ট্যালিরাঁদকে, যিনি স্বাধীনতাকেই সবার উপর

স্থান দিয়েছিলেন। মেরী তাঁর গ্রন্থের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে নারী ও তার ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত মত আলোচনা করে তার ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেছেন এবং তা বর্জন করেছেন। বিধাতাই নারীকে পুরুষের তুলনায় হীন করে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা স্বভাবতই পুরুষের অধীন - যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই বদ্ধমুল ধারণাকে তিনি আঘাত করেছেন, শুধু তাই নয় তিনি আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বদল ঘটিয়ে নারীর অবস্থা পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষতন্ত্র নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য কীভাবে ভিন্ন করে দিয়েছে নারীর ভূমিকা, নিষ্পাপতার নামে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে তাদের। নারীকে নারীসুলভ গুণাবলী অর্জনের জন্য সমাজের যে প্রচেষ্টা তাকে তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধান বাধা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন নারীর বুদ্ধির বিকাশ না ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটানো হয় যাতে সে পুরুষের উপযুক্ত ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, নারী প্রাকৃতিকভাবে হীন নয়, সে সামাজিকভাবে হীনরূপে সৃষ্ট। এই গ্রন্থটিকেই নারীবাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যে নারীবাদের সূচনা ধরা যেতে পারে এই গ্রন্থ থেকে।[৬]

এটা প্রত্যাশিত ছিল যে ফরাশী বিপ্লব নারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের দৈহিক সামর্থ্য ও চরিত্র যে আদৌ পরিপন্থী নয়, তা বলিষ্ঠ ভাবে প্রমাণিত হয় ফরাসী বিপ্লবে; কিন্তু বিপ্লব নারীর অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায় নি। ফলে এক ধরণের ক্ষোভ ও চেতনার বোধ জন্ম নিচ্ছিল, যা নারীদের বিদ্রোহী করে তুলছিল, তারা অবস্থার পরিবর্তনের দাবী তুলছিল। যুগ যুগান্তের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য এটাই ছিল নারী আন্দোলনের সূচনা পর্ব। অবশ্য 'নারীবাদ' (Feminism) শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই নারীবাদী তত্ত্ব জন্ম নিতে শুরু করেছে। নারীবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয় এই ভাবনা থেকে যে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের সমান নয় এবং সমাজের নির্মিতি এমনই যে, নারীকে অবদমিত করেই পুরুষ উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে যায়। নারীবাদীরা এই বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করতে নানা তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন, নতুন তত্ত্ব গঠন করেছেন এবং তাকে দূর করতে নানা পন্থার সুপারিশ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ড এ মধ্যবিত্ত নারীদের একটা ছোট্ট গোষ্ঠী নারীদের উন্নত শিক্ষাদান, আইনগত অধিকারের উন্নতি, বিশেষত বিবাহ সম্পর্কিত আইন, চাকুরির সুযোগ ও ভোটাধিকারের জন্য সোচ্চার হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ১৮২৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন রদ হয়। মেয়ে ও স্ত্রী নাগরিক বিশেষণ থেকে বঞ্চিত হয়। নেপোলিয়ানও নারীর মধ্যে একজন মা-কে দেখতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি এইসব প্রতিবন্ধকতা দিয়ে দূর করা যায় নি। যন্ত্রের আবির্ভাব সামন্ততন্ত্রকে প্রায়

পরিপূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি নারীর মুক্তিকেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শিল্পবিপ্লব নারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, কারণ তারা গৃহস্থালি থেকে বেরিয়ে এসে কারখানার উৎপাদনে একটা নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল। মার্ক্স - এঙ্গেল্স এর পুরো পরিসরকে মেপেছিলেন এবং সর্বহারার মুক্তির মধ্যে নিহিত নারী মুক্তির অনিবার্যতা তারা দেখেছিলেন। কিন্তু কারখানাতেও নারীশ্রম পুরুষ শ্রমের তুলনায় কম মূল্য পায় বলে, মেয়েরা সংগঠিত হয়ে গড়ে তোলে বিভিন্ন 'শিল্প শ্রমিক সংঘ'। ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের প্যারি শহরে জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক প্যারি কমিউনের। বস্তুতপক্ষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যে সমস্ত নারীবাদী আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল তা ছিল মূলত ভোটাধিকার আন্দোলন। ইতিমধ্যে ১৮৪৭ খ্রীঃ ৮ মার্চের এক ধর্মঘটে, যেখানে আমেরিকার বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকেরা ১৬ ঘন্টার পরিবর্তে ১০ ঘন্টা কাজের দাবী পেশ করে। ১৯০৯ সালের ৮ই মার্চ শিকাগো শহরে নারী শ্রমিকদের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭ টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করে। এই সম্মেলনেই ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এই ভোটাধিকার আন্দোলন চলে নিউজিল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী, পোল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং সুইডেনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নারীবাদীদের এক ভিন্ন ধারা গড়ে ওঠে যারা প্রশ্ন তুলছিলেন নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শুধু তাই নয় সাহিত্য সংস্কৃতিতে নারীকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছিলেন এরা। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্ মুহূর্তে পশ্চিমী প্রচার যন্ত্রগুলি এক যান্ত্রিক (sterotype) নতুন নারীকে (New woman) তুলে ধরতে লাগলো, যারা পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল কেবলমাত্র নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রেই নয়, তার পোষাক এবং জীবনযাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। ১৯২০ সালের পর থেকে নারীবাদীরা নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে নি, নারীর বিশেষ চাহিদার প্রতিও তারা দৃষ্টি দিতে শুরু করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা চাকরীতে যোগ দিলেও এবং ভোটাধিকার অর্জিত হলেও পেশায় যোগদানকারী মেয়েদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বরং সমাজের প্রবণতা ছিল তাদেরকে পূর্বের ভূমিকায় (স্ত্রী-মাতা-সেবিকা) আবদ্ধ রাখা। ইতিমধ্যে একদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধা ও রান্নাঘরের জিনিসপত্রের উন্নতি নারীর জীবনে বেশ কিছু বাড়তি সময় এনে দেয়। অন্য দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে নানা রকম নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরী হল যা শুধু পুরুষদের দ্বারা নয়, নারীদের দ্বারাও সম্পাদিত হতে পারে। শুধু তাই নয় মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার ফলে পরিবারে স্বামী স্ত্রী

উভয়কেই রোজগার করতে বাধ্য করে এবং বেশী সংখ্যক মহিলা চাকরীর বাজারে পা রাখে। অবশ্য বাইরের কাজ করলেও ঘরের অধিকাংশ কাজ এবং বাচ্চা সামলানো পুরোপুরিই ছিল মেয়েদের কাজ। এই সমস্ত উপাদানগুলি মেয়েদের ক্রমশঃ সচেতন করে তুলতে লাগলো এই ব্যাপারে যে, বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক ভূমিকার যে পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে সমতা রেখে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছিল না। এছাড়াও ষাটের দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন নারীকে উৎসাহিত করে একই ভাবে গণআন্দোলন ও সামাজিক সমালোচনার মাধ্যমে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়াসী হতে।

নারীর হীন অবস্থার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায়; পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যেখানে নারীর স্থান সম্মানের ছিল না। ভারতের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার চিত্রটাও অনুরূপ। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য্য তাঁর 'প্রাচীন ভারত' গ্রন্থে বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যে উচ্চ প্রশংসা শোনা যায় তা কতটা ভিত্তিহীন। যে আর্যরা বেদ নিয়ে আসে, তারা সম্ভবত খ্রীঃপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। বেদ থেকে জানা যায় আর্যদের সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক । পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য ছিল। পশুপালন, শিকার ইত্যাদি পুরুষদেরই কাজ ছিল। মেয়েরা ক্ষেত পাহারা দেওয়া, কাপড়বোনা, রান্না ও সংসারের দেখাশোনা করত। সেবার কাজ তাদেরই ছিল। যযুর্বেদের সময় থেকে তাদের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় শিল্পকর্ম, ধাতুর, মাটির, কাঠের, চামড়ার, পুঁতির কাজ চালু হয়। পেশার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা আরও কমতে লাগলো। নারী আরও গৃহবন্দী হল। তার কাজ ঠিক হয়ে গেল স্বামী সন্তান ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সেবা। এই সময় পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। সমাজে নারীপণ প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদে সতীনকে মেরে ফেলার প্রার্থনা আছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় সমাজে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত ছিল। তবে সমাজে সহমরণ প্রথা চালু ছিল না। বরং বিধবা স্ত্রীকে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিবারের বায়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের কর্তা হতেন। তবে একেবারে প্রথম যুগে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কতৃত্ব ছিল। অনুমান করা যায় সে সময় পর্যন্ত মেয়েদের খানিকটা স্বাধীনতা ছিল। কন্যা নিজে বর পছন্দ করে বিয়ে করতে পারতো। নারীদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ারও উল্লেখ আছে। আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যখন যুদ্ধ চলছে সেই সময় হয়তো নারীদের অবস্থা অনেকটা উন্নত ছিল। তারা যুদ্ধও করতো। তবে এটি সাধারণ ঘটনা ছিল বলে মনে হয়না। আর এরকম দু'একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা দিয়ে নারীর উচ্চাবস্থার সিদ্ধান্ত কতটা গ্রহণযোগ্য তা ভাববার বিষয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এই স্বাধীনতা হারায়। প্রথম দিকে আর্যদেবতাদের অনেকেই দেবী ছিলেন— উষা, ইলা, ভারতী, বাক্ সরস্বতী ইত্যাদি। ক্রমে পুরুষ দেবতার সংখ্যা বাড়তে থাকে।

মোটামুটি খ্রীঃ পূর্ব নবম শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে বেদের যে 'ব্রাহ্মণ' অংশগুলি লিখিত হচ্ছিল, সেই সময় থেকে সমাজে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপ্রত্তি বাড়ছিল। শাস্ত্রে বলা হয়েছে দক্ষিণা যজমান কে শূচি করে। আর সেই দক্ষিণার মধ্যে অন্যতম ছিল নারী। এই সময় থেকে নারীকে যে বস্তু সামগ্রীর মধ্যে (অশ্বমেধ যজ্ঞে চারশ' গাভী, চারহাজার সোনার টুকরো, চারটি বিবাহিতা নারী, একটি কুমারী দান করা হত) গণ্য করা হত তা পরিষ্কার।

যজুর্বেদের সময় থেকে সমাজে নারীর অবস্থা হীনতর হয়। এই সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে পুরুষ বহুপত্নীক এবং তা শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'একটি যজ্ঞে যেমন একটা লাঠির গায়ে দুখন্ড কাপড় জড়ানো থাকে তেমনি একটি পুরুষকে দুটি নারী অবলম্বন করে থাকবে, কিন্তু কোন নারী দুজন পুরুষকে অবলম্বন করতে পারেবে না। এছাড়াও বলা হয়েছে সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে তুলে ধরা হবে আর পুত্র কন্যা সন্তান কে মাটিতে নামিয়ে রাখা হবে। যজ্ঞে লাঠি দিয়ে ঘিকে মারা হয়। নারীকেও তেমনি লাঠি দিয়ে মেরে বশীভূত রাখতে হবে, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার না থাকে। পুত্র জীবনে আর্শিবাদ, কন্যা অভিশাপ। নারী ও শূদ্রের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে বারবার। সভা সমিতি যেখানে গোষ্ঠীর ভাগ্য ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হত, সেখানে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে শাস্ত্র। বলা হয়েছে নারী শূদ্র কালোপাখি ও কুকুর মিথ্যা। এদের দেখা উচিৎ নয়। ছুঁচো বেঁজি, শূদ্র ও কালসাপ মারলে একই প্রায়শ্চিত্য। এসবের মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল। নারীকে যজ্ঞে শ'য়ে শ'য়ে দক্ষিনা দেওয়া হত। গরু বাছুর ষাঁড় বলদের সঙ্গে একই তালিকায় উল্লেখ থাকতো নারীদের।

তবে একথা বলা প্রয়োজন যে শাস্ত্র বিধিগুলি মূলতঃ ছিল অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের জন্য, নীচের তলার মেয়েরা সবসময় স্বাধীনভাবে উপার্জন করে এসেছে। ক্ষেতের কাজ, গরু চরানো বা হাতে তৈরী জিনিস বিক্রি করে তারা কিছু রোজগার করতো। এদের উপর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ীর কতৃত্ব কিছুটা শিথিল ছিল। নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সমাজে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন সম্ভব ছিল না, নারী নিগ্রহ ছিল শাস্ত্র-সম্মত, পুরোপুরি মানুষের মর্যাদা না পাওয়াই ছিল তখন নারীর জন্য স্বাভাবিক। সতীত্বকে কঠোর ব্রতের মত প্রচার করা হত। গুপ্তযুগে প্রথম সতীদাহের নজির পাওয়া যায়। 'কামসূত্র' থেকে জানা যায় বারাঙ্গনারা ছিল নগর জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ। ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পে নারীকে যতই মর্যাদা দেওয়া হোক্ বাস্তবে তাদের অবস্থা পুরুষের সমকক্ষ ছিল না; উচ্চবর্ণের নারীরা পড়াশুনার সীমিত সুযোগ পেলেও জনজীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারা অংশগ্রহন করতে পারতো না।

পরবর্তী বেশ কয়েকশ' বছরেও নারীর অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সমাজচিন্তক বঙ্কিম চন্দ্র বলেন—

> 'যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনি আমার মানসপটে সহমরণ-প্রবৃত্তা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশন মধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। ... অগ্নিদগ্ধ স্বামীচরণ ধ্যান করিতেছেন... আনন প্রফুল্ল... ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!... যখন আমি ভাবি যে কিছুদিন হইল আমাদের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়... কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিবনা? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ-তোমরা এ বঙ্গ দেশের সাররত্ন... '[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই ছিল আমাদের দেশে নারীর আকাঙ্ক্ষিত রূপ। আত্মত্যাগের মহিমায় আর পতিভক্তির মোহজালে গড়া এই নারী রূপ মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনার ঐতিহ্যে গড়া, মনু পরাশরের স্মৃতির অনুশাসনে শাসিত। এই রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার অন্তত ছেচল্লিশ বছর অগে সতিদাহ প্রথা রদ করা হয়েছে। এর উনিশ বছর আগে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হয়েছে। কাজেই কমলাকান্ত যে নারীমূর্তি দেখতে চান তার পুনরাবর্তন আর সম্ভব নয়। শুধু সতীদাহ বা বিধবা বিবাহ নয়, নারী শিক্ষা, সংস্কার মুক্তি, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা এ সবই এই রচনার পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমের মানস-নারীর রূপ এই।

প্রাথমিক ভাবে শিক্ষা মানুষের মনে সচেতনতার বীজ বুনে দেয় অথচ আমাদের দেশে শিক্ষাকে নারীর জন্য অস্পৃশ্য করে রাখা হয় সুদীর্ঘকাল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নি এবং পরেও পর্দাপ্রথা অমান্য করে খুব অল্প সংখ্যক মেয়েই বিদ্যালয়ে যেতে পেরেছে কারণ, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এমন উপযোগী জন্তু ব্যাতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হত না। তবে মেয়েদের সম্পর্কে এই ধরণের ভাবনা শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীজুড়েই বিদ্যমান ছিল। রাশিয়ার একটি সরকারী প্রতিবেদনে মহিলাদের নিকৃষ্টতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় এইভাবেই — "প্রকৃতিই নিম্নশ্রেণীর জীব হিসেবে মহিলাদের অপরের উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছে। অতএব মহিলাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শাসন করা নয়, স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করাই তাঁদের নিয়তি নির্ধারিত।"[৮]

এই সময় মেয়েদের শুধু যে লেখাপড়া শেখানো হতনা তাই নয়, মনে করা হত, মেয়েরা বোধ বুদ্ধিহীন, লেখাপড়া শেখার উপযুক্তই নয়। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শিক্ষিত একাংশের মধ্যে মেয়েদের এই হীন অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

কিছু মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। এই সংস্কার করতে গিয়ে প্রথম যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল ধর্মীয় অনুশাসন এবং নারীদের দুরবস্থা। ধর্ম অনেক সময়েই ছিল নারীর হীন অবস্থার কারণ— যেমন সহমরণ প্রথা, বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ, অকাল বৈধব্যও বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি। তাই রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারকরা সবার আগে দৃষ্টি দেন এই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথাগুলির দিকে। অনেক লড়াই আন্দোলন ও ব্যক্তিগত ত্যাগের মধ্যে দিয়ে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয় এবং বিধবা বিবাহ আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। আমাদের দেশের মেয়েরা বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার লাভ করে।

এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগেই ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ মহিলাদের জন্য সমান অধিকার দাবী করেন। এরা টম পেইনের মত দার্শনিকের চিন্তাধারার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন। এই টম পেইন আবার ওলস্টোন ক্রাফ্‌টের সঙ্গে পরিচিত ও তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই সময় ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ টম পেইন, রিচার্ড কার্লাইল, বেন্থাম, ওয়েন প্রমুখর রচনা ও ভাবধারার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের প্রভাবে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে সভ্যতা সম্পর্কে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং মহিলাদের সম্পর্কে এক নতুন মূল্যবোধের সূচনা হয়। যে শিক্ষিত পুরুষেরা এতদিন অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে সুখে ছিলেন, তারা স্ত্রীদের সঙ্গে এক ধরণের যোগাযোগের অভাব অনুভব করলেন। হয়তো সেকারনেই ১৮২০র দশক থেকে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অনেকেই স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে উদবিগ্ন হয়ে ওঠেন। ১৮৭০ সালে শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক সম্প্রদায় স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নেন। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে ধীরলয়ে হলেও স্ত্রী শিক্ষা প্রসার লাভ করে। যদিও একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সে সময় স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যে এত আন্দোলন হয় এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুমাতা ও সুগৃহিণী তৈরী করা, যারা আলোকপ্রাপ্ত সন্তানের জন্ম দেবে। এই সময় যে আদর্শ নারীর ভাবমূর্তি কল্পনা করে তাদেবকে মূলত শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, সেই ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করা এক নারী কাঠামোর দৃষ্টান্তের সঙ্গে চিরাচরিত ভারতীয় নারীত্বের আর্দশের সংমিশ্রনে।

নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই এর পেছনে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আমরা আগেই বলেছি। পাশ্চাত্যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। ইউরোপীয় রেনেশাঁ সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল মানুষকে — পুরুষ মানুষকে। তাই দার্শনিক রুশোর আদর্শ প্রজাতন্ত্রে নারীর কোন স্থান ছিল না। নারী শিক্ষা সম্পর্কে তার বক্তব্য তিনি 'এমিলি' গ্রন্থে খুব প্রাঞ্চলভাবে তুলে ধরেছেন — "মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে পুরুষের সঙ্গে তার স্বভাবকে তুলনা করে। তারা আমাদের খুশি করবে, আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, এমনভাবে থাকবে যাতে আমরা তাদের শ্রদ্ধা করতে

পারি। শৈশবে (তারা) আমাদের শিক্ষা দেবে, বড় হয়ে উঠলে দেখাশুনা করবে, পরামর্শ দেবে; সান্ত্বনা দেবে, আমাদের জীবন কে সহজ আর সুন্দর করে তুলবে। সবসময় এগুলিই নারীর কর্তব্য এবং এসম্বন্ধে তাদের — শৈশবেই শিক্ষা দিতে হবে।" [৯]

দীর্ঘকাল ধরে রুশোর মতের প্রতিধ্বনি সমাজ ও সাহিত্যে শোনা গেছে। ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষে তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। রুশোর বক্তব্যকে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ক'রে মেরী অ্যাসটেল (১৬৬৬ - ১৭৩১) শিক্ষাকে নারী পুরুষ বৈষম্যের মুক্তিমন্ত্র বলে প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর স্বাভাবিকভাবেই শুধু শিক্ষার অধিকার নিয়েই নারীরা সন্তুষ্ট থাকতে চায়নি; সম্পত্তি, সন্তান, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভোটের অধিকার তারা দাবী করেছে। পরে এই আন্দোলন অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আমাদের দেশে মূলতঃ শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই নারীরা পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে সঙ্গত কারণেই। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এই সংস্কারের অন্যতম বিষয় ছিল। স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল অবরোধবাসিনীদের সামনে বহির্জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা। এব্যাপারে নেতৃত্ব দেন ইয়ং বেঙ্গল এবং তদানীন্তন কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি। রামমোহন স্ত্রীদের শিক্ষা লাভের ক্ষমতা স্বীকার করেছিলেন 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন?'[১০] — এ ছিল তথাকথিত স্ত্রীবুদ্ধির স্বল্পতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। কিন্তু এদেশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম মিশনারীরাই করেছিলেন। Female Juvenile Society (1819) এই কাজ করেছিল মিস কুক ১৮২১ সালে এদেশে এসে এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে প্যারিচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণের নেতৃত্বে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ সালে ড্রিংক ওয়াটার বিটন Calcutta Female School স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে স্কুলটির নাম হয় বেথুন স্কুল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর প্রথমাবধি এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে একদিকে যেমন রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত মনীষীরা যুক্ত ছিলেন যাঁরা সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীর স্বাধীকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন এবং সেজন্য শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে নারীর অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, যারা ধর্মীয় বিধি বিধানের অসঙ্গতি প্রকাশ করে মানুষ হিসেবে নারীর উত্থানে সচেষ্ট ছিল।

'ইয়ং বেঙ্গল' এবং রামমোহনের দ্বিমুখী প্রচেষ্টা সার্থকরূপ লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টায়। বহু বিবাহ বন্ধ ও বিধবা - বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা সে যুগের পক্ষে যে কতখানি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল, তা আজও কিছুটা অনুভব করা যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা সে সময় যে মানবেতর জীবন যাপন করতো, তাকেই তারা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিল; কারণ সে সময় বাঙালীর

পারিবাবিক জীবন মূলতঃ পরিচালিত হত ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা এবং সেই আদর্শে নারীজীবনের উদ্দেশ্য ছিল সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন ও পুত্র উৎপাদন। ঈশ্বরচন্দ্র সরাসরি নারীর এই ভূমিকায় কুঠারাঘাত না করলেও মানবেতর জীবন থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে শিক্ষার আলোয় নতুন পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। এছাড়া 'গৌরীদান প্রথা'র দৌরাত্মে ৮/৯ বছরের মেয়েদের সঙ্গে ২৩/২৪ বছরের যুবকের বিবাহ সেসময় সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফলে অসংখ্য মেয়ের মৃত্যু — এই প্রথার ভয়াবহতা দেখিয়ে তিনি একে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। (বাল্য বিবাহ বন্ধ হওয়া উচিৎ কিনা - এতদ্বিষয়ক বিচার।

পরবর্তীতে দেশজুড়ে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে ও সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঊনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এর সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের উন্নতির এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। ১৮৭৮ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৮২ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। কাদম্বিনী বসু সেই বছরই ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন এবং ১৮৮৮ সালে ডাক্তারী পাশ করে চিকিৎসা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে চন্দ্রমুখী বসু এম এ পরীক্ষায উত্তীর্ণ হন। ইউরোপীয় রেনেশাঁ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। আমাদের দেশেও নবজাগরণের সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষ হিসেবে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলের আত্মপ্রকাশের অধিকার আছে।[১১]

স্বাধীনতা বা মুক্তির যে আধুনিক ধারণা তার সঙ্গে তখনকার মহিলারা পরিচিত না থাকলেও অন্তঃপুরের বাইরের জগৎ সম্পর্কে এবং মানুষ হিসেবে তাদের ন্যূনতম আইনগত ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে প্রথম মুখ খোলেন কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু 'অবলা কুলের বিদ্যাভ্যাস' গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে বলেন যে মহিলাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করার জন্যই পুরুষরা তাদের অশিক্ষিত করে রাখেন। কৈলাসবাসিনী ছাড়াও রমা সুন্দরী দাসী, সারদা দেবী, রাজবালা দেবী, কামিনী সেন প্রমুখরা মেয়েদের হীন অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন। বন্দী থাকার যন্ত্রণা তারা উপলব্ধি করেছিলেন একথা সত্য কিন্তু স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্পর্কে তাঁরা কি বুঝতেন তা তাদের লেখা থেকে পরিষ্কার বুঝে ওঠা যায় না। তবে এই সময় মেয়েরা যে শুধু অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এলেন তাই নয় তাঁরা রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে এক বাৎসরিক সম্মেলনে (বোম্বাই) ডঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীরা যুক্ত থাকলেও উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা ছিল না, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে মহিলারা চাকরী

নিতে শুরু করে। পারিবারিক ভূমিকার বাইরে সামাজিক ভূমিকা পালনে তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করে।

একথা সত্য যে বাংলাদেশে মহিলাদের হীনদশা মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন পুরুষেরা। কিন্তু আজ 'নারী-মুক্তি' (ইমানসিপেশন) বলতে যা বোঝায় তা লাভ করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না, এমন কি পুরুষদের অধীনতা থেকে নারীদের মুক্ত করার আন্দোলনও তা ছিল না, বরং পুরুষরা তাদের নিজেদের জগৎকে উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই আন্দোলন করেন। মহিলারা যখন কিছুটা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন এবং নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হন তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ফলে পুরুষেরা তাদের যে ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা তা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন — বরং বলা ভাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেদের হীনাবস্থার জন্য সরাসরি পুরুষদেরই দায়ী করেছেন। এই সময় মহিলাদের মধ্যে সামান্য মাত্রায় হলেও আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ জন্ম নিচ্ছিল। তাঁরা সমাজ সচেতনও হচ্ছিলেন। তাহেরন নেসা তাঁর গ্রন্থে তাদের যুক্তি দেখান যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় মিলে সমাজ গঠন করে। সুতরাং কেবল পুরুষরাই সমাজের উন্নতি করতে পারেন না। সমাজে মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে; কিন্তু নিজেদের অজ্ঞানতা ও অনগ্রসরতার জন্য তাঁরা এ ভূমিকা পালন করতে অক্ষম।[১২] কয়েক দশক পরে তাহেরন নেসার যুক্তিকে আরো বলিষ্ঠ ভাবে হাজির করেন বেগম রোকেয়া। তিনি নারী ও পুরুষকে সমাজ গাড়ীর দুটি চাকার সঙ্গে তুলনা করে বলেন একটি চাকা ছোট ও একটি চাকা বড় হলে, সে কখনোই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য বোধের জাগরণের ফলে নারীদের আচরণেও পার্থক্য ঘটে, ফলে যে সমস্ত পুরুষেরা নারী মুক্তির কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অনেকেই বিরূপ হন; এর ফলে মহিলাদের অগ্রগতি বাধা পায়। এই বাধা ছাড়াও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও মহিলাদের অগ্রগতির ধারাকে রুদ্ধ করে। ''জাতীয়তাবাদ নিজ দেশের অতীত ঐতিহ্য, প্রথা ও সামাজিক সংগঠনসমূহ থেকে স্বাস্থ্য লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সুতরাং ভারতীয় নারীর দেশজ ভাবমূর্তির দিকেই জাতীয়তাবাদী আহ্বান ধাবিত হয়।''[১৩]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদানকারী মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না, তবে এখানেও তাদের মধ্যে কাজ করেছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকার চেতনা। ধর্মের ক্ষেত্রে মহিলারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, জাতীয়তাবাদ আর ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের যোগের ফলে দেশকে দেবীমাতৃকা শক্তি রূপে কল্পনা করা হয় এবং নারীরা নিজেদেরকে সেই শক্তির অংশ মনে করে সহজেই জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। তাই মুক্তির পথে এগিয়ে যাবার একটি ধাপ হিসেবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধরা না গেলেও একথা সত্য যে বাইরের রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই নারীরা নিজেদের অপমানকর অবস্থা সম্পর্কে আরো সচেতন হয়। এছাড়া মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট এই ধারণা পিছু হটতে শুরু করে। কারণ এই সমস্ত আন্দোলনে মেয়েরা যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে তারাও পুরুষদের মতই লড়াই চালাতে পারেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মত্যাগের আগে যে চিঠি লিখে গিয়েছিলেন তাতে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজে মেয়েদের জোর করে নীচে ঠেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক জগতে আত্মদান করে তারা প্রমান করে দিয়েছেন যে তারা কোন অংশেই পুরুষদের চেয়ে কম নয়।এই চিঠি থেকে স্পষ্ট, যে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মেয়েদের চেতনার রূপান্তরের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই মূল্যবোধের বড় রকমের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কামিনী রায় তার 'ঠাকুরমার চিঠি'তে। ঠাকুরমা বলছেন যে ঘরই হচ্ছে মেয়েদের উপযুক্ত স্থান, আর নাতনি বলছে বাইরের জগতেই বাস্তবে মেয়েরা অর্জন করতে পারবে মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমতা। "আমরা সবাই মা বা স্ত্রী হব — এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা সবাই চাই আত্মবিকাশ।" (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কামিনী রায় মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবীতে যোগ দেন বঙ্গীয় নারী সমাজে এবং এই অধিকারের দাবীতে সারা জীবন সংগ্রাম করেন।) একে অবশ্য পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব থেকে পরিপূর্ণ নারীমুক্তির দিকে যাত্রা বলা যাবে না কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যে চিরাচরিত মূল্যবোধের প্রচারক ছিল, এই মেয়েরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা বলতেন বাড়ীতেই হোক আর বাইরের জগতেই হোক, পুরুষদের একাধিপত্য আর চলবে না।[১৪]

রাজনীতিতে প্রবেশের ফলে জীবন জগৎ ও নিজেদের সম্বন্ধে মেয়েদের ধ্যান ধারণা পাল্টে গেল। এল একটা গভীর আত্মবিশ্বাস। তবে এর সবটাই রাজনৈতিক কার্যকারণে ঘটে নি। দেশীয় সাহিত্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জাতীয়তাবাদ একটা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশের মেয়েদের উপর এই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ১৯০৫ সালের আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পরোক্ষ ভাবে তারাই ছিলেন এই আন্দোলনের পরিচালিকা শক্তি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ খ্রীঃ বেথুন কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন, ও তিনিই প্রথম মহিলা যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পান। স্বর্ণকুমারীর

216615
11 JUN 2009
LIBRARY

যোগ্য উত্তরাধিকারী ছোট মেয়ে সরলা জীবনের নানা ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার বাঁধা পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি মহিশূরে চাকরী করতে যান অবিবাহিত অবস্থায়, যা তখনকার দিনে ভাবা যেত না। তাছাড়া স্বদেশী জাগরণের কর্মকান্ডে সোৎসাহে জড়িত হয়েছিলেন তিনি। বাংলার ছেলেদের বীরত্বের ব্রতে দীক্ষিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন এবং 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রচলন করেন।

সরলা দেবীর আত্মজীবনী (জীবনের ঝরাপাতা) থেকে তৎকালীন পটভূমিকায় মেয়েদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাসটি পাওয়া যায়। যদিও এই মহিলারা অধিকাংশই এসেছিলেন উচ্চশ্রেণী থেকে। স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫) গড়ে তোলেন 'সখী সমিতি'। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও মহিলা শিল্প মেলার আয়োজন এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'সখী সমিতি'র নারী কল্যাণের আদর্শ বৃহত্তর ও পূর্ণতর রূপ পেয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোট মেয়ে সরলা দেবীর 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল'এর পরিকল্পনায়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি নারী সমাজের স্বাবলম্বন ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। সাংবাদিকতা, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমেও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করে এই সংগঠন। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সমস্ত সংগ্রামে মেয়েদের ছিল সক্রিয় ভূমিকা। বীরভূমের পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহে নারী সমাজের ভূমিকা অতুলনীয়।

বিংশ শতাব্দীর ২য় ও ৩য় দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয় — (১) কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে, (২) সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ গ্রহণ, (৩) শ্রমিক কৃষকের অর্থনৈতিক সংগ্রামে যোগদান।

যদিও আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করলেও সংগ্রাম পরিচালনা বা নীতি-নির্ধারণে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। এই সময় আমাদের দেশে নারী আন্দোলন স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু পাশ্চাত্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার আদায়ের দাবী জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। এ দেশের যে সমস্ত মহিলা ও ছাত্রীরা ওদেশে ছিল তারা ঐ আন্দোলনগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। যদিও আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বতন্ত্র ভাবে নারীর সমস্যা গুরুত্ব পায় নি, তবু এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁরা যে বাইরের জগতে পা রেখেছিলেন — সেটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে নারীরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। তারা এই আন্দোলনে যে সাংগঠনিক শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তা অতুলনীয়। পরবর্তীতে তেভাগা আন্দোলনেও মেয়েরা বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫০ থেকে নারী আন্দোলনের গতি গেছে দু'দিকে। এক দিকে নতুন করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা এবং

শ্রমিক ধর্মঘট, অন্যদিকে উদ্বাস্তু পূনর্বাসনে সহায়তা। ১৯৫৪ সালে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন গঠিত হয়েছে, এই ফেডারেশন যথাক্রমে পণপ্রথা নিবারণ, সমান মজুরী ও সবেতন প্রসবকালীন ছুটির দাবীতে আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করে। গ্রামীন মহিলা সংঘ, অল ইন্ডিয়া উইমেনস কংগ্রেস ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র ভারতে নারী সমাজের দাবীগুলি সোচ্চার হয়ে উঠতে সাহায্য করে। ১৯৫০ এ ভারতের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। তবে এই সমানাধিকার মেয়েদের খুব লড়াই করে অর্জন করতে হয় নি। ১৯৬১ - ৭১ সালের জনগণনায় দেখা যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে মেয়েদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজেও তাদের ভূমিকা নগন্য। ১৯৭৩ সালে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত হয়।নারীদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে যারা নারীদের সমস্যা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। সারা বিশ্বে নারীর অবস্থা পর্যালোচনা করে এই বছরকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষণা করা হয়।

বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি কিছু কিছু শ্রমিক আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল, প্রথম দিকে তারা অসংগঠিত অবস্থায় থাকলেও পরবর্তী কালে কয়েকজনের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়, এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন মহিলা। ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে সন্তোষকুমারী দেবী এবং শেষের দিকে প্রভাবতী দাশগুপ্ত ও বেগম সাকিনা শ্রমিক অন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সন্তোষকুমারী কাজ করেছেন চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে, আর জমাদার - মেথর - ধাঙড়দের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাকিনা বেগম প্রভাবতী দাশগুপ্ত, বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন কমিউনিষ্ট কর্মী সুধা রায় এবং ডঃ মৈত্রেয়ী বসু। এছাড়াও বিমল প্রতিভা দেবী, বীণা দাস, পদ্মিনী সেনগুপ্ত প্রমুখ। গৌরীপুর চটকলে শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তোষকুমারী দেবীর নেতৃত্বে। তিনিই বাংলার প্রথম শ্রমিক নেত্রী। এই মহিলা নেত্রীরা সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং অনেকেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর; কিন্তু এরা অনায়াসে ধাঙড় বা বন্দর শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছেন, নিজেদের বাড়ীতেও ওদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক পরিবারের আস্থা এরা অর্জন করেছিলেন। বিশ - ত্রিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে এদের নাম মুখে মুখে ফিরতো।প্রথম যুগের এই সমস্ত নেত্রীদের কাজ-কর্ম ভুল ত্রুটি দুর্বলতা নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, বহু বাধা পেরিয়ে, অনেক সাহস ও সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছে ও তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে। সে সময় সামান্য কিছু মহিলার মধ্যেও যে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছিল, তা কম উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়।[১৫]

পরবর্তী কালে তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এই নারীরা যতটা স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারতেন তার সঙ্গে আধুনিক

নারীমুক্তির ধারণার কোন তুলনা চলে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত অন্তত কিছু সংখ্যক নারী তাদের অধিকার ও অবস্থান সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন। স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, সরলা দেবী প্রমুখদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা নারী সম্পর্কিত উদার চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও যে মহিলারা আংশিক ভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন, তাঁরা আর সাংসারিক গন্ডীর মধ্যে ফিরে গিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ফলে স্বাধীনচেতা মহিলা ও পুরুষদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় এবং মহিলারা তাদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন। আলোচ্য মহিলারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছুটা স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠেন; কিন্তু তাঁরা যে নতুন ধারণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে খানিকটা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে ধর্ম সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়েছিলেন বিবাহ বা সংসারকে জীবনের সার বলে মনে করেন নি, সামান্য পরিমানে হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করছিলেন — এসবই প্রমাণ করে যত কম মাত্রাতেই হোক এঁরা 'নারীমুক্তির' পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময়ের নারী বেগম রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনকে স্বাধীনতা লাভের পথ হিসেবে ভেবেছেন — 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। ..... উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?' এই ধরনের সচেতনতাই বাংলাদেশে 'ফেমিনিজম' বা নারীচেতনাবাদের জন্ম দিয়েছে, একথা বলা যেতেই পারে। তবে বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা তখনই হয়েছে যখন নারীরা লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে - কৈলাসবাসিনী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী, বেগম রোকেয়া .... সাহিত্যে যাদের সংগ্রামের ইতিহাস জীবন্ত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বা রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পের মধ্যে।

এরপরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষদের যোগ্য সহধর্মিনী বানানোর প্রয়োজনে মূলত নারী শিক্ষা শুরু হয়। পরাধীন ভারতে নারীরাই হয়ে উঠেছিল সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। তাই তাদেরকে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী 'শিক্ষিত' করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তবে প্রতিবাদের ভাষা এই সময়ও শোনা গেছে। জোতিবা ফুলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বলেন — 'The subjugation of women as an instrument for maintaining Brahaminical dominance in Indian Society.'[১৬]

তৃতীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পৃথক থাকে নি। আমরা এই সময়ের আন্দোলনে নারীর যোগদান ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন চলছিল তাতে নারীর অংশ গ্রহণ অবশ্যই নারীমুক্তি আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ধাপ। স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকে নারী মুক্তির প্রশ্নটি অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬১ - ৭১ সালের জনগণনার মাধ্যমে যখন নারী সমাজের দুরবস্থা প্রকটিত হয় তখন সরকার নড়েচড়ে বসে। ইতিমধ্যে ১৯৭৫ সালে জাতি সংঘের সদস্য সংস্থাগুলির মহিলারা মেক্সিকোতে এক সম্মেলনে সমবেত হয়। এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও নারীমুক্তি আন্দোলন এক নতুন দিশা পায়। এতদিন পর্যন্ত নারী আন্দোলনের যে দিকে কারোরই নজর পড়ে নি তা হল সমাজে নারীর নিজস্ব ভূমিকা কি? তার কি কোন স্বতন্ত্রতা আছে? নারীর নিজস্ব পরিচয় খোঁজার এই যে নতুন চেতনা তা বর্তমান নারীবাদী আন্দোলনের এক প্রধান দিক্ চিহ্ন রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তাই আত্ম আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই আজকের নারী আন্দোলনের প্রধান দিক।

নারীরা এই সময় থেকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, প্রতিবাদে সামিল হয়। ১৯৭৪ সালের ৮ই মার্চ মহারাষ্ট্রে প্রথম 'নারীদিবস' পালিত হয়। ১৯৮০ সালের ৮ই মার্চ মথুরা 'ধর্ষণ মামলার' রায়ের পুনর্বিবেচনার দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল হয় এবং শাহবানু মামলার রায়ের বিরূদ্ধে সরকার যে মুসলিম অধিরক্ষা বিল নিয়ে আসে তার বিরূদ্ধে বিভিন্ন নারী সংগঠন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একদিকে যেমন প্রতিবাদ প্রতিরোধের মিছিল হয়, অন্যদিকে পোষ্টার, গান, নাটক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নারী সচেতনতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ এবং কলকাতায় গড়ে উঠতে থাকে Feminist Documentation Centre. নারীদের জন্যই প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকা গড়ে উঠতে থাকে পাঠাগার; যেমন দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় 'মানুষী', চেতলায় স্থাপিত হয় মহিলা পাঠাগার ইত্যাদি। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয় Indian Association of Women's Studies এর প্রথম সম্মেলন। ক্রমে নারী আন্দোলন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। তারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা 'মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র'। পাশাপাশি চলেছে সমানাধিকার অর্জনের বাস্তব লড়াইও। নারী নির্যাতন রোধে কিছু আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে সরকার।

ঐতিহাসিক ভাবে নারীবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, যা ১৮০০ সালে শুরু হয়ে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চলেছে, তাকে বলা হচ্ছে First Wave Feminism। অবশ্য এই নামকরণ হয়েছে পরবর্তী কালে যখন নারীবাদ একটি স্বতন্ত্র দর্শন হিসেবে তত্ত্বায়িত হয়েছে। এই তত্ত্বায়নের মূল সূত্র হল — 'Gender is the central category of analysis' - বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয়বর্গ হল লিঙ্গ।

এই নারীবাদীরা সমানাধিকারের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে এগিয়েছেন। এঁরা ছিলেন মূলতঃ মানবতাবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্টের হাতে, পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে জন স্টুয়ার্ট মিলের The subjection of woman (১৮৬৯) এ। এই ধারার অনুগামীদের বলা হয় Liberal Feminist. এই মতবাদের লক্ষ্য আইনগত সমানাধিকার, শিক্ষা-দীক্ষায় সমান সুযোগ ইত্যাদি। গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সমানাধিকার, পুরুষ যেমন সমাজে ভূমিকা স্থির করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি নারীকেও ভূমিকা নির্ধারণের অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে। এঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ — নিজের ইচ্ছা মত ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকা। তবে এ ব্যাপারে পুরোনো ও আধুনিক Liberal Feminist দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আধুনিকদের মতে, নারীর স্বার্থ বিরোধী সমস্ত আইন শুধু বাতিল করলেই চলবে না, এত দিনের বৈষম্য দূর করার জন্য নারীদের কিছু বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। যেমন — প্রসবকালীন ছুটি ও ভাতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের অধিকার ইত্যাদি। এঁরা মনে করেন না যে নারী মুক্তির জন্য সমাজ বদলের প্রয়োজন আছে। বরং ওলষ্টোন ক্রাফ্টের মধ্যে দেখতে পাওয়া ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজ্‌মের রেশ। শোষণ নিপীড়নের অবসানের পথ হিসেবে সমতার যে প্রকল্প ইউটোপিয়ান সোশ্যালিষ্টরা হাজির করেছিলেন, কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টোর ভাষায় — They want to improve the condition of every member of society, even that of the most favoured. Hence, they habitually apeal to society at large, without distinction of class, may, by preference, to the ruling class. নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ওলষ্টোন ক্রাফ্টের ভূমিকা ছিল অনেকটা এই রকম। ভিন্ডিকেশন হয়ে উঠেছিল একটি দীর্ঘ আবেদন — পুরুষের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে। তবে ভিন্ডিকেশনের বিপ্লবী উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম মেয়েদের অবদমনকে গোটা সমাজের ব্যাধি রূপে ব্যাখ্যা করা এবং দ্বিতীয় এই ব্যাধি নিরাময়ে নারী সমাজের তরফে ও প্রতি আবেদন। তবে এই ধারার নারীবাদীরা আটকে ছিলেন সমানাধিকারের দাবীর মধ্যে।

এই নারীবাদীরা যে সমানাধিকারের কথা বলেন, তার যথার্থতা প্রতিপাদন করেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের পূজারী। তিনি যুগ যুগ ধরে নারীর যে শোচনীয় অবস্থা তার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। আক্রমণ করেছেন নারীর আইনগত বঞ্চনা, শিক্ষার নামে অশিক্ষা এবং ভিক্টোরিও যুগের স্ত্রী-সুলভ অধীনতাকে। তিনি দাবী করেছিলেন নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের বিশুদ্ধ সাম্য। তাঁর মতে —"যে নীতি নিয়ন্ত্রণ করে দু'লিঙ্গের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক — এক লিঙ্গের কাছে আরেক লিঙ্গের আইনগত অধীনতা — তা সম্পূর্ণ ভুল; এবং এখন মানুষের অগ্রগতির এক প্রধান বাধা। এর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশুদ্ধ সাম্যের নীতি, এতে এক পক্ষের থাকবে না বিশেষ কোন ক্ষমতা বা সুবিধা, অন্য পক্ষের থাকবে না কোন অসুবিধা।"

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৬০এর দশকে যে সমস্ত সামাজিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন, গড়ে ওঠে সেখান থেকেই জন্ম নেয় নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের (Second Wave Feminism)। এরা প্রশ্ন তুলেছিলেন Gender এবং Sex নিয়ে। এদের শ্লোগান হল 'The Personal is Political' । এই নারীরা শুধু আর নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে নি, তারা তাদের পোষাক ও জীবনযাত্রা নির্ধারণের প্রশ্নে পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই নারীবাদীরাই প্রথম প্রশ্ন তোলে নারীর নিজস্ব সত্তা (Identity) এবং যৌনতা নির্ধারণের (Sexuality) অধিকার বিষয়ে। এই ধারার নারীবাদীদের কেন্দ্রীয় ভাবনা ছিল নারীর ব্যক্তিগত দুর্ভোগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফল। এই আদর্শ সিমন দ্য বোভোয়া বা কেট মিলেট এর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিল। এঁদেরকে বলা হয় র‍্যাডিক্যাল কেমিনিষ্ট (Radical Feminist)। এরা নারী নিপীড়নের সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করেন Gender বা লিঙ্গ দিয়ে। এরা মনে করেন নারীর দুরবস্থার মূল কারণ জৈবিক, নারীকে গর্ভধারণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ভাবে প্রথম মেনে নিতে হয় পুরুষের অধীনতা এবং আজও তা সমভাবে বর্তমান। জৈবিক কারণেই পরিবারের উৎপত্তি হয় এবং পরিবার একটি জৈবিক উপাদান। এঁরা দাবী করেন আত্ম নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ অধিকার ও যৌন স্বাধীনতা।

নারীবাদীদের এই তরঙ্গ সিমন দ্য বোভেয়ার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। এরা নারী পুরুষের বৈষম্য ঘোচানোর তুলনায় স্বাতন্ত্র্যের দিকে বেশি নজর দিলেন। নারীবাদের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গড়ে যেতে থাকেন জুলিয়া ক্রিস্তেভা, এলেন সিজো, বেটি ফ্রিডান, লুসি ইরিগারে, ফায়ারষ্টোন শুলামিথ প্রমুখরা। এদের হাতেই জন্ম নেয় নারীবাদের উত্তরআধুনিক ধারা। যারা প্রধানত দৃষ্টিপাত করেন ভাষাগত লিঙ্গ বৈষম্যের দিকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. The Routledge Companion to Feminism and Post Feminism. Edited by - Sara Gamble, London 2001, P-6

২. পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এঙ্গেল্‌স, এন.বি.এ., কল, ১৯৯৯, পৃ. - ৩৯

৩. ঐ, পৃ. - ৪১

৪. স্ত্রী লিঙ্গ, (দ্য সেকেন্ড সেক্স)— সিমন দ্য বোভোয়ার —দীপায়ন, কল, ২০০১, পৃ.ঃ ১ - ৯০

৫. ঐ, পৃ. - ১০২

৬. নারী- হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। ২০০১ পৃঃ ১৮-৫০

৭. 'স্ত্রী লোকের রূপ/কমলাকান্তের দপ্তর- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমরচনাবলী, সাক্ষরতা প্রকাশন (১৯৭৩) প্রবন্ধ খন্ড প্রথম অংশ। পৃ. ১৪০

৮. নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী— গোলাম মুরশিদ। নয়া উদ্যোগ, কল, ২০০১ পৃঃ ২০

৯. নারী- হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। ২০০১ পৃ. ৯৮

১০. সহমরন বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ - রামমোহন রায়, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কল, ১৯৭৩, পৃ.- ২০২

১১. নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী— গোলাম মুরশিদ। নয়া উদ্যোগ, কল, ২০০১ পৃঃ ৭৬-৭৭

১২. ঐ, পৃ.- ৪৫

১৩. 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ' ঃ ভারতী রায়। গ্রন্থ ঃ ভারত ইতিহাসে নারী, কে.পি.বাগচী এন্ড কোং, কল, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৬

১৪. ঐ, পৃ. ৬০

১৫. বাংলাদেশের প্রথম যুগের (১৯২০ - ৪০) শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্ব - মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ ঃ ভারত ইতিহাসে নারী - পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী। কল, ১৯৮৯, পৃ.- ৭১

১৬. ভুমিকা / শর্বাণী গোস্বামী, লৌকিক উদ্যান (মানবী সংখ্যা), কল, ১৯৯৯, পৃঃ ৯-১৬